পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

দ্বিতীয় পর্ব

মুহাম্মদ ﷺ-এর যেসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে

বহু দূরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ﷺ যেসব খবর দিয়েছিলেন, তাঁর সাহাবিগণ সেগুলো নিজেদের কিতাবে লিখে রেখেছিলেন, তারপর সেগুলো দুনিয়ার চোখের সামনে ঠিক তেমনই ঘটেছে যেমন তিনি বলেছিলেন — অক্ষরে অক্ষরে।

19 প্রমাণ

বিজয়

৪২ কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই বিজিত হবে

কনস্টান্টিনোপল অবশ্যই বিজিত হবে। কতই না উত্তম হবে তার সেই সেনাপতি, আর কতই না উত্তম হবে সেই বাহিনী

বর্ণনা করেছেন আহমাদ, আর বুখারি তাঁর আত-তারিখ গ্রন্থে — একদল আলিম সহিহ বলেছেন

কনস্টান্টিনোপল: প্রাচীন দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গনগরী

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, **কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে**, আর যিনি তা জয় করবেন সেই সেনাপতি ও তাঁর বাহিনীর প্রশংসা করেছিলেন। আট শতাব্দীরও বেশি পরে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তা জয় করেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কনস্টান্টিনোপল ছিল **পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের রাজধানী**, আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী: বিশাল তিন স্তরের প্রাচীর, লোহার শিকল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া এক উপসাগর, আর তিন দিকে ঘিরে থাকা সমুদ্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে বিশটিরও বেশি অবরোধ সয়ে টিকে ছিল। আর যিনি এ কথা বলেছিলেন, তিনি তখন মদিনায়, আর তাঁর রাষ্ট্রের কোনো নৌবহরই ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

1453 সালের 29 মে একুশ বছর বয়সী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ নগরীটি জয় করেন, আর সে কারণেই তাঁর উপাধি হয় "আল-ফাতিহ" অর্থাৎ বিজেতা। তিনি এমন এক দানব কামান ব্যবহার করেন, যার নজির কেউ দেখেনি, আর শিকল এড়াতে **জাহাজগুলোকে ডাঙার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যান** চর্বি মাখানো কাঠের পাটাতনে। ঘটনাটি বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি, আর একেই মধ্যযুগের সমাপ্তি ধরা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিস কেবল বিজয়ের খবর দিয়েই থামেনি, বরং **বিজেতা ও তাঁর বাহিনীর প্রশংসা করেছে আগেভাগেই** — এতে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়, কেননা তা বক্তব্যের সত্যতাকে বেঁধে দেয় এমন এক লোকের গুণের সঙ্গে, যার জন্মই তখনো হয়নি। আট শতাব্দী ধরে মুসলিম সেনাপতিরা এই সম্মানের জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন: মুআবিয়া ও সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক নগরী অবরোধ করেছেন, হারুনুর রশিদের বাহিনী 165 হিজরিতে তার উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছেও পার হয়নি, কেউই তা জয় করতে পারেননি — **আর প্রতিটি ব্যর্থ চেষ্টাই ছিল হাদিসটিকে মিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ, সত্য প্রমাণ করার নয়**। তারপর বিজয় এল একুশ বছরের এক তরুণের হাতে, এমন এক প্রযুক্তিতে যা কেউ কল্পনাও করেনি।

সূত্র Runciman – *The Fall of Constantinople 1453* · The fall of Constantinople, 29 May 1453

সাম্রাজ্যের পতন

83

কিসরা ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কিসরা নেই

কিসরা ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কিসরা নেই, আর কায়সার ধ্বংস হলে তার পরে আর কোনো কায়সার নেই। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাদের দুজনের ধনভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে

বর্ণনা করেছেন বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি

বলা হয় যখন তারা শক্তির চূড়ায়

পারস্য ও রোম শাসন করছে
পরিচিত দুনিয়ার অর্ধেক
আর মুসলিমরা মদিনায়
টাকাহীন এক নবজাত রাষ্ট্র

আর ঘটল তাঁর কথামতোই

ইয়াজদিগার্দ — শেষ কিসরা
পারস্য মুছে গেল আর ফিরল না
আর রোম হারাল শাম ও মিসর
আর দুজনের সম্পদ বায়তুল মালে

বলা আর ঘটার ব্যবধান: ত্রিশ বছরেরও কম

শতাব্দী ধরে শাসন করা দুই সাম্রাজ্য… একটি নিঃশেষ হলো, অন্যটি গুটিয়ে গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, **পারস্যের সম্রাট মারা গেলে তার পরে তার মতো আর কোনো সম্রাট আসবে না**, রোমের সম্রাটের বেলায়ও তাই, আর তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে। সবই ঘটেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পারস্য ও রোম ছিল নির্বিবাদে **দুনিয়ার দুই মহাশক্তি**, পূর্ব ও পশ্চিম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, অগণিত সৈন্য ও ধনভাণ্ডারের মালিক। আর মুসলিমরা তখন মদিনার এক ছোট্ট জামাত — রাষ্ট্র নেই, সেনাবাহিনী নেই, ধনভাণ্ডার নেই, এই দুই বিশাল সাম্রাজ্যের মাঝখানে আটকে থাকা। ঠিক সেই অবস্থায় এই কথা বলা হয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

651 খ্রিষ্টাব্দে **তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ** নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাসানীয় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পতন ঘটে, আর তারপর পারস্যে ঐ উপাধিধারী কোনো সম্রাট আর কোনোদিন দাঁড়ায়নি। রোমের রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু **সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা হারিয়ে** গুটিয়ে যায়, আর ঐসব ভূখণ্ডে কায়সারের কোনো কর্তৃত্ব আর থাকেনি। উমরের খিলাফতকালে কিসরার ধনভাণ্ডার মদিনায় আনা হয় ও বণ্টন করা হয়; তখন তিনি বলেছিলেন: "যারা এসব পৌঁছে দিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আমানতদার।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুই বাক্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি লক্ষ করুন। কিসরার ব্যাপারে বলা হয়েছিল "তার পরে আর কোনো কিসরা নেই" — আর **পারস্য চিরতরে শেষ হয়ে গেছে**। কায়সারের ব্যাপারেও সেই একই কথা — অথচ **রোম শেষ হয়নি, বরং ইসলামের ভূখণ্ড থেকে গুটিয়ে গেছে**। আর এটিই হাদিসের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ: কথা তো তাকে নিয়েই, যে ঐ ভূমি শাসন করে ও তা নিয়ে বিবাদ করে। এর চেয়েও সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, হাদিস কেন্দ্রে রেখেছে **ধনভাণ্ডারকে, ভূমিকে নয়**: "তাদের দুজনের ধনভাণ্ডার অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে" — এই বাক্যটির উপরেই তিনি শপথ করেছিলেন। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দুই সম্রাটের সম্পদের প্রতিশ্রুতি, এমন এক মানুষের মুখে, যিনি নিজের রাতের খাবারই পেতেন না।

সূত্র الطبري – «تاريخُ الرُّسُل والمُلوك» · Yazdegerd III – the last Sasanian king, d. 651

84

অভ্যন্তরীণ ফিতনা

আম্মারকে হত্যা করবে সীমালঙ্ঘনকারী দল

হায় আম্মার! তাকে হত্যা করবে সীমালঙ্ঘনকারী দল। সে তাদের ডাকবে জান্নাতের দিকে, আর তারা তাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে

বর্ণনা করেছেন বুখারি ও মুসলিম — মুত্তাফাকুন আলাইহি

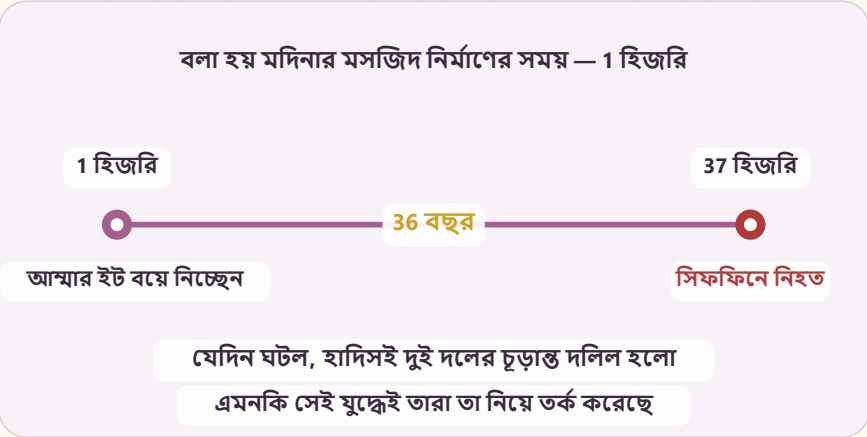

হিজরতের প্রথম বছরে বলা এক ভবিষ্যদ্বাণী, যা ঘটেছে ছত্রিশ বছর পরে

সহজ কথায়

মসজিদ নির্মাণের সময় নবী ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসির সম্পর্কে বলেছিলেন, **তাঁকে হত্যা করবে এক যালিম দল**। ছত্রিশ বছর পরে সিফফিনের যুদ্ধে আম্মার নিহত হন — আর মানুষ জেনে গেল, সীমালঙ্ঘনকারী কারা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই কথা যখন বলা হয়, মুসলিমরা তখন **মদিনায় নিজেদের প্রথম দিনগুলোতে পরস্পরকে ভালোবাসা একটিমাত্র জামাত** — তাঁদের মধ্যে না ছিল ফিতনা, না বিভেদ, আর প্রত্যেকেই নিজের হাতে মসজিদ গড়ছেন। মুসলিমরা পরস্পরে লড়বে, আর একজন মহান সাহাবি মুসলিমদের হাতেই নিহত হবেন — এ ভাবনা তখন কারো মনের ধারেকাছেও ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আম্মার ইবনে ইয়াসির 37 হিজরিতে সিফফিনের যুদ্ধে নিহত হন, তখন তাঁর বয়স নব্বইয়ের কোঠায়, আর তিনি ছিলেন আলি ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে। **তিনি নিহত হয়েছেন জানাজানি হতেই শামের বাহিনীতে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে যায়**, কেননা হাদিসটি তাঁদের মধ্যে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম দুটিতেই আছে, আর একদল সাহাবি থেকে এত অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত যে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, **বিবদমান দুই পক্ষই এটি জানত ও এর দলিল দিত** — কাজেই এটি ঘটনার পরে লিখে রাখা কোনো খবর নয়, বরং ঘটনার কয়েক দশক আগে থেকেই প্রচলিত; এমনকি এর বাস্তবায়ন দুই বাহিনীর একটিতে সত্যিকারের সংকট তৈরি করেছিল। হাদিসটি যদি সিফফিনের পরে বানানো হতো, তবে যে পক্ষকে তা দোষী সাব্যস্ত করে, সে পক্ষ তা কিছুতেই মেনে নিত না। আর নবী ﷺ নাম নিয়েছেন **নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির**, বলেছেন **তাঁর মৃত্যুর ধরন** (হত্যা, রোগ নয়), আর দিয়েছেন **হত্যাকারীদের পরিচয়** (সীমালঙ্ঘনকারী দল, অর্থাৎ যালিম মুসলিম, কাফির নয়)। তিনটি শর্তই একসঙ্গে ঘটেছে।

রাজনীতি

85 আমার এই ছেলে নেতা... তার মাধ্যমে আল্লাহ দুই দলের মীমাংসা করবেন

নিশ্চয়ই আমার এই ছেলে একজন নেতা, আর আশা করা যায় আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিশাল দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন

বর্ণনা করেছেন বুখারি — সহিহ

বলা হয় যখন হাসান ছোট শিশু

না দুই দল, না লড়াই
আর গোটা উম্মত এক
আর শিশুটি বালেগ হয়নি
আর কোনো পদও নেই

→

41 হিজরি — ঐক্যের বছর

উম্মত দুই বাহিনীতে ভাগ হলো
হাসান সন্ধির জন্য সরে দাঁড়ান
তাই মুসলিমরা এক হলো
আর নাম হলো: ঐক্যের বছর

সক্ষম থেকেও খিলাফত ছেড়ে দিলেন — রক্তপাত বাঁচল

প্রাথমিক ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মীমাংসা, আর তার কারিগরের নাম বলা হয়েছিল তিনি বড় হওয়ার আগেই

সহজ কথায়

নবী ﷺ তাঁর নাতি হাসানকে কোলে নিলেন, তখন তিনি ছোট্ট শিশু, আর বললেন: **আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বিশাল দলের মীমাংসা করে দেবেন**। প্রায় চল্লিশ বছর পরে তিনি ঠিক তা-ই করলেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উম্মতের মধ্যে তখন দুটি দল ছিলই না — ছিল নিজেদের নবীর পেছনে একটিমাত্র জামাত। আর যে শিশুটিকে নিয়ে কথা, সে তখনো বড়ই হয়নি, কী হবে তা-ও কেউ জানে না। হাদিসটি একসঙ্গে তিনটি অজানা বিষয়ের খবর দিচ্ছে: উম্মত **বিভক্ত হবে**, সেই বিভক্তি **মীমাংসায় গিয়ে শেষ হবে**, আর এই নির্দিষ্ট শিশুটিই তা সম্পন্ন করবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

40 হিজরিতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পর হাসানের হাতে খিলাফতের বাইআত নেওয়া হয়, আর তিনি ছিলেন এক বিশাল বাহিনীর শীর্ষে। এরপর **মুসলিমদের রক্তপাত ঠেকাতে 41 হিজরিতে তিনি তা মুআবিয়ার হাতে ছেড়ে দেন**, ফলে বছরের পর বছর যুদ্ধের পরে উম্মত একজন মানুষের নেতৃত্বে এক হয়ে যায়। গোটা ইসলামি ইতিহাসে সেই বছরটির নাম রাখা হয়েছে **"আমুল জামাআহ", অর্থাৎ ঐক্যের বছর**। হাদিসটি সহিহ বুখারিতে আছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই একটিমাত্র বাক্য কী কী দাবি করছে, ভেবে দেখুন: যে উম্মত এখনো ভাগই হয়নি, তাতে **আসন্ন এক ফিতনার** ঘোষণা; **যে মানুষটি তা শেষ করবেন** তাঁকে নির্দিষ্ট করা, অথচ তিনি তখন কথা না-ফোটা শিশু; আর **পদ্ধতিটিও** নির্দিষ্ট করা — যুদ্ধে জয় নয়, মীমাংসা। শেষেরটিই সবচেয়ে বিস্ময়কর: বাহিনী ও বৈধতা যাঁর হাতে, তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কাজ তো লড়াই করা। নবীর ﷺ নাতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সক্ষম থাকা অবস্থাতেই তিনি ছেড়ে দেবেন — **যে কাজের জন্য তাঁর নিজের কিছু অনুসারীই তাঁকে দোষারোপ করেছিলেন** — আর তারপর সেটিকেই বলা হচ্ছে "নেতৃত্ব" ও "মীমাংসা"; এ এমন এক রায়, যা প্রতিটি রাজনৈতিক প্রত্যাশার বিপরীত। আর তা অক্ষরে অক্ষরে ঘটেছে।

86 খিলাফত ত্রিশ বছর... তারপর রাজতন্ত্র

আমার উম্মতে খিলাফত ত্রিশ বছর, তারপর এর পরে রাজতন্ত্র

বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তিরমিজি — আলবানি সহিহ বলেছেন

পুরোপুরি ত্রিশ বছরে পাঁচজন খলিফা... তারপর শাসনব্যবস্থাই বদলে গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছিলেন, নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত টিকবে কেবল **ত্রিশ বছর**, তারপর শাসন রূপ নেবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজতন্ত্রে। হিসাব মিলেছে হুবহু।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তখন গোটা পৃথিবীর শাসনব্যবস্থাই ছিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র: পারস্য, রোম, আবিসিনিয়া, ইয়েমেন। দিগন্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর যে ব্যবস্থা তখনো শুরুই হয়নি, তার জন্য **বছরের হিসাবে একটি আয়ু** ঠিক করে দেওয়া, তারপর বলা যে তা অন্য কিছুতে গিয়ে ঠেকবে — এ এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ নির্দিষ্টকরণ, যা গুনে-হিসাব করে যাচাই করা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবীর ﷺ ওফাতের মধ্য দিয়ে 11 হিজরিতে খিলাফত শুরু হয়: আবু বকর দুই বছর তিন মাস, তারপর উমর সাড়ে দশ বছর, তারপর উসমান প্রায় বারো বছর, তারপর আলি প্রায় পাঁচ বছর, তারপর হাসান প্রায় ছয় মাস — 41 হিজরিতে তিনি ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত। **মোট: পুরোপুরি ত্রিশ বছর।** এরপর শাসন হয়ে গেল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রাজতন্ত্র, প্রথমে উমাইয়াদের মধ্যে, তারপর আব্বাসিদের মধ্যে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি একটি **মাপা যায় ও মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এমন সংখ্যা**, ব্যাখ্যার সুযোগ রাখা কোনো ঢালাও বর্ণনা নয়। মেয়াদ দুই বছর বেশি বা কম হলেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেত। আরও বিস্ময়কর, হাদিস বলেনি "তারপর ইসলাম শেষ হয়ে যাবে", বলেনি "তারপর কুফর ছেয়ে যাবে" — বলেছে "তারপর **রাজতন্ত্র**", অর্থাৎ রাষ্ট্র টিকে থেকেই শাসনের রূপটি বদলে যাবে। আর ঠিক তা-ই ঘটেছে: ইসলামি রাষ্ট্র টিকে থেকেছে ও বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিটি বদলে গেছে। রাজনৈতিক বর্ণনার এই নিখুঁততা সংখ্যার নিখুঁততার চেয়ে কম নয়।

87

নগর ও নির্মাণ

রাখালেরা উঁচু দালান তোলায় পাল্লা দেবে

দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে, আর আপনি দেখবেন খালি পায়ের, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষ-রাখালেরা দালান তোলায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — জিবরিলের হাদিস

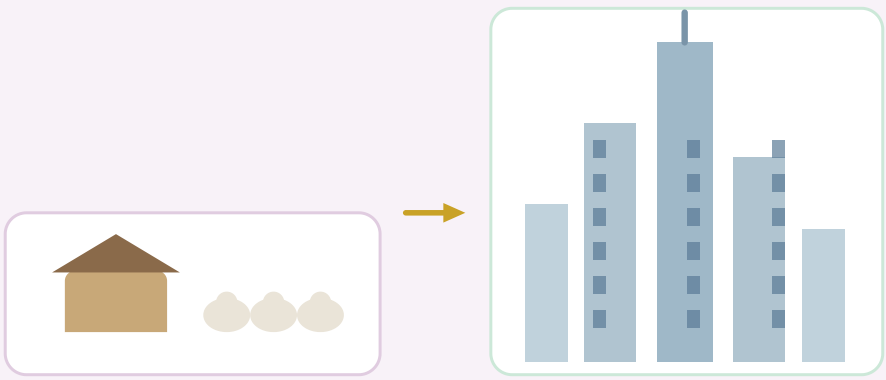

তাঁবু আর মাটির ঘরে রাখালেরা

উপদ্বীপে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দালান

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দালানটি দাঁড়িয়ে আছে সেই মরুভূমিতে, যার ঘর ছিল পশমের আর মাটির

সহজ কথায়

নবী ﷺ জানিয়েছেন, শেষ যুগের একটি আলামত হলো **দরিদ্র, খালি পায়ের মেষ-রাখালেরা** উঁচু দালান তোলায় পাল্লা দেবে। আর এটিই আজ আপনি নিজের চোখে দেখছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সে যুগে আরব উপদ্বীপ ছিল পৃথিবীর বসতিপূর্ণ ভূখণ্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র: নদী নেই, ফসল নেই, জানা কোনো খনিজও নেই। এর অধিবাসীরা ছিল রাখাল, চারণভূমির পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত; ঘর ছিল পশম আর মাটির, একতলার বেশি নয়। এই ভূমি একদিন সম্পদ ও নির্মাণের কেন্দ্র হবে — কেউ তা কল্পনাও করেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিশ শতকের তিরিশের দশকে উপদ্বীপে তেল আবিষ্কৃত হয়, আর দুই প্রজন্মেই এর অবস্থা বদলে যায়। আজ দুবাইয়ের **বুরজ খলিফা** ৪২৪ মিটার উঁচু হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দালান, নির্মাণাধীন **জেদ্দা টাওয়ার** এক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আর মক্কার **আবরাজুল বাইত** ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বিশাল দালানগুলোর একটি। আর "সবচেয়ে উঁচু" হওয়ার প্রতিযোগিতা ঠিক ওই অঞ্চলেরই ঘোষিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি বাক্যেই তিনটি শর্ত একে সাধারণ প্রজ্ঞাবাক্য নয়, ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়ে দেয়। প্রথম: **কারা এটি করবে তার পরিচয়** নির্দিষ্ট করা — "খালি পায়ের, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষ-রাখাল"; অর্থাৎ নির্মাতা **দরিদ্ররাই**, নির্মাণে দীর্ঘ ঐতিহ্যওয়ালা কোনো ধনী জাতি নয়। দ্বিতীয়: ক্রিয়াপদ **"পাল্লা দেবে"** — আরবি রূপটি পারস্পরিক, যা কেবল উঁচু নির্মাণ নয়, **উচ্চতায় পাল্লা দেওয়াকেই** বোঝায়। তৃতীয়: এটি বলা হয়েছে **এক বিরাট পরিবর্তনের আলামত** হিসেবে, অর্থাৎ এমন অস্বাভাবিক কিছু যা নিদর্শন গণ্য হওয়ার যোগ্য। আর যিনি রুক্ষ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে বলেন, এর অধিবাসীরা একদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ দালান নিয়ে পাল্লা দেবে — তিনি অনুমান থেকে কথা বলছেন না।

৪৪ যতক্ষণ না আরবের ভূমি আবার তৃণভূমি ও নদী হয়ে ফেরে

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ বেড়ে উপচে পড়ে, যতক্ষণ না আরবের ভূমি আবার তৃণভূমি ও নদীতে ফিরে যায়।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

আরবের বালির নিচে প্রাচীন নদীখাত, যা উপগ্রহ উন্মোচন করেছে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, আরবের ভূমি সবুজ তৃণভূমি ও বহমান নদীতে **ফিরে যাবে**। মূল শব্দটি হলো **"ফিরে যাবে"** — অর্থাৎ আগে তা এমনই ছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব উপদ্বীপ লিখিত ইতিহাসেরও আগে থেকে রুক্ষ মরুভূমি, আর এর অধিবাসীরা এর অন্য কোনো অবস্থা জানত না। এর সুদূর অতীতের জলবায়ু জানার কোনো উপায়ই ছিল না। আর এটি তৃণভূমিতে ফিরে যাবে বলার অর্থ **একদা তা তৃণভূমিই ছিল** — সংবাদটি ঠিক এখানেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উপগ্রহ ও ভূভেদী রাডার আরবের বালির নিচে উন্মোচন করেছে **প্রাচীন নদীখাতের এক বিশাল জাল**, যাকে বলা হয় জীবাশ্ম-নদী; এর সবচেয়ে বড় দুটি ওয়াদি আল-বাতিন ও ওয়াদি আর-রুম্মা। প্রাচীন জলবায়ুর গবেষণা প্রমাণ করেছে, উপদ্বীপ বারবার আর্দ্র যুগ পার করেছে (সর্বশেষটি প্রায় 6,000 বছর আগে), যখন সেখানে হ্রদ, নদী, চারণভূমি ও বড় প্রাণী ছিল। শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের পাশে জলহস্তী ও কুমিরের হাড় এবং পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। আর জলবায়ুচক্র ভবিষ্যতে আর্দ্রতা ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি শব্দই মুজিজা বহন করছে: **"ফিরে যাবে"**। এটি একসঙ্গে দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করে: এমন এক ভূতাত্ত্বিক **অতীত** সম্পর্কে সংবাদ, যা কারও জানা ছিল না; আর এমন এক **ভবিষ্যৎ** সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যা এখনো ঘটেনি। বলা হতো "হয়ে যাবে", তবে তা কেবল ভবিষ্যতের কথা হতো। আর হাদিসের ভেতরের ইঙ্গিতটি লক্ষ করুন: এর সঙ্গে জোড়া হয়েছে "সম্পদ বেড়ে উপচে পড়বে" — আর এই অর্ধেকটি তেলের মাধ্যমে সত্যিই ঘটে গেছে, আর সেই তেলই আজ সেখানকার বিশাল বনায়ন ও কৃষি প্রকল্পের অর্থ জোগাচ্ছে।

আগ্নেয়গিরি

৪৯ হিজাজের ভূমি থেকে বেরোনো এক আগুন

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না হিজাজের ভূমি থেকে এমন এক আগুন বেরোয়, যা বুসরার উটের গর্দান আলোকিত করে দেবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

এক ঐতিহাসিক অগ্ন্যুৎপাত, যা উৎসগ্রন্থে ও লাভার স্তরে লিপিবদ্ধ

সহজ কথায়

নবী ﷺ জানিয়েছেন, হিজাজের ভূমি থেকে এমন এক আগুন বেরোবে, যার আলো কয়েকশ কিলোমিটার দূরে শামের **বুসরা** শহর পর্যন্ত পৌঁছাবে। 1256 খ্রিস্টাব্দে তা ঘটেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

হিজাজ মরুভূমির দেশ, এর মানুষ জীবনে আগ্নেয়গিরি দেখেনি। "আগ্নেয়গিরি" শব্দটিই তাদের পরিবেশে অজানা ছিল। আর **আগুন বেরোনোর স্থান** এবং **আলোর বিস্তার** — অন্য দেশের একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম ধরে — বলে দেওয়া এমন খুঁটিনাটি, যা নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া বলা যায় না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

654 হিজরির জুমাদাল আখিরা / 1256 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মদিনার পূর্বে **হাররা রাহাতে** একটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, যা বায়ান্ন দিন চলে, আর তা থেকে তেইশ কিলোমিটার দীর্ঘ লাভার নদী বয়ে যায়। সমকালীন ঐতিহাসিকেরা — আবু শামা, কুরতুবি ও নববি — এর বর্ণনা দিয়েছেন, আর ইবনে কাসির তাঁদের সংবাদ নিজের "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া"-তে উদ্ধৃত করেছেন; তাঁরা লিখেছেন যে **এর আলো বুসরা, তাইমা ও মক্কা থেকে দেখা গিয়েছিল**, আর মানুষ রাতে তার আলোয় দেখত। ভূতত্ত্ববিদেরা হাররা রাহাতের লাভাপ্রবাহ পরীক্ষা করে সেগুলোর কাল এই ঘটনার সঙ্গেই মিলিয়েছেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বর্ণনার সূক্ষ্মতা লক্ষ করুন: শুধু "এক বিরাট আগুন" বলা হয়নি, বরং **দৃশ্যমান ফলটি** নির্দিষ্ট করা হয়েছে: "**বুসরার উটের গর্দান আলোকিত করে দেবে**"। বুসরা দক্ষিণ শামের একটি শহর, মদিনা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে। আর বিশেষ করে **উটের গর্দানের** বিবরণটি বোঝার আগ পর্যন্ত অদ্ভুত লাগে: দিগন্তের দূরের আভা কেবল সেসব জিনিসকেই আলোকিত করে যা দিগন্তরেখার উপরে ওঠে, আর কাফেলার সবচেয়ে উঁচু জিনিস উটের গর্দান। ছয় শতাব্দী পরে ঐতিহাসিকেরা ঠিক এটিই বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি বহু স্বতন্ত্র উৎসে লিপিবদ্ধ, আর পাথরে ভূতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত।

সূত্র Camp, Hooper, Roobol & White (1987) – *The Madinah eruption* · «ابن كثير – «البداية والنهاية»

90 সময় ঘনিয়ে আসবে

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না সময় ঘনিয়ে আসে; ফলে বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো, আর সপ্তাহ হবে এক দিনের মতো।

আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত — আলবানি সহিহ বলেছেন

যা এক মাস নিত, এখন তা দুই ঘণ্টা নেয়

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, সময় **ঘনিয়ে আসবে**, ফলে বছর হবে মাসের মতো আর মাস হবে সপ্তাহের মতো। আমরা এটিই যাপন করছি: যাতে আগে মাস লাগত, এখন লাগে ঘণ্টা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের অভিজ্ঞতায় সময় ছিল অপরিবর্তনীয়। উট আর ঘোড়ায় সফর, চিঠি পথে মাসের পর মাস, খবর পৌঁছাত মৌসুম পেরিয়ে। এই অনুপাত কখনো বদলাতে পারে — তা ভাবাই যেত না; এগুলো ছিল জীবনের অটল ধ্রুবক।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কাফেলা যা এক মাসে পাড়ি দিত, উড়োজাহাজ তা দুই ঘণ্টায় পাড়ি দেয়। যে চিঠি মাসের পর মাস নিত, তা এখন এক সেকেন্ডেরও কমে পৌঁছে যায়। গ্রন্থাগারে যে অনুসন্ধানে সারা জীবন লাগত, তা মিনিটে শেষ হয়। এই ত্বরণ সমাজবিজ্ঞানে **"কাল-স্থান সংকোচন"** (Time-Space Compression) নামে গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে; এটি একটি স্বীকৃত পরিভাষা, যা পরিবহন ও যোগাযোগের গতি দূরত্বের উপলব্ধিতে কী প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা করে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রকাশভঙ্গিটিই মুজিজা। বলা হয়নি "বরকত কমে যাবে", কিংবা "আয়ু দ্রুত কেটে যাবে" — দুটিই সম্ভাব্য ও গ্রহণযোগ্য পাঠ। বরং ব্যবহার করা হয়েছে **ক্রমিক এক গাণিতিক অনুপাতের** রূপ: বছর → মাস, মাস → সপ্তাহ, সপ্তাহ → দিন, দিন → ঘণ্টা। অর্থাৎ প্রতি ধাপে সময়ের একক সংকুচিত হয়ে নামে প্রায় এক-দশমাংশে। আর আরবি ক্রিয়াপদ **"ঘনিয়ে আসা"** পারস্পরিক রূপের, যা প্রান্তগুলোর পরস্পরের কাছে আসা বোঝায় — এটি দূরত্ব সংকোচনের সূক্ষ্ম বর্ণনা, কেবল বরকত কমার নয়। আর বিশ শতকে ভূগোলবিদ ডেভিড হার্ভে যে "কাল-স্থান সংকোচন" পরিভাষাটি গড়েছেন, তা প্রায় এই বাক্যেরই আক্ষরিক অনুবাদ।

সূত্র David Harvey — *The Condition of Postmodernity*, 1989 · Time-space compression

91 সম্পদ এত বাড়বে যে সদকা নেওয়ার কেউ থাকবে না

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আপনাদের মধ্যে সম্পদ বেড়ে উপচে পড়ে, এমনকি সম্পদের মালিককে ভাবিয়ে তোলে — কে তার সদকা গ্রহণ করবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

নবী ﷺ-এর পেটে পাথর বাঁধা থেকে... গ্রহীতাহীন উদ্‌বৃত্ত পর্যন্ত

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন সম্পদ এত বাড়বে যে **সদকা গ্রহণ করবে এমন একজন গরিব খুঁজে পেতে সম্পদের মালিককে হয়রান হতে হবে**। ইতিহাসে এটি একাধিকবার ঘটেছে, আজও ঘটছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই কথাগুলো বলা হয়েছিল এমন এক সমাজে **যা সত্যিই ক্ষুধায় ভুগছিল**: খন্দকের দিনে সাহাবিরা পেটে পাথর বাঁধতেন, আর আহলুস সুফফা গা ঢাকার মতো কাপড়ও পেতেন না। সম্পদ এত উপচে পড়বে যে কোনো গরিবই পাওয়া যাবে না — সেদিন এই ধারণাটিই অকল্পনীয় ছিল। আর সেই সময় পর্যন্ত মানবজাতির গোটা ইতিহাস ছিল অভাবের ইতিহাস, প্রাচুর্যের নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনে আবদুল আজিজের খিলাফতে এটি স্পষ্টভাবে ঘটেছিল; ঐতিহাসিকেরা এমনকি লিখেছেন যে তাঁর কর্মচারীরা সম্পদ নিয়ে ঘুরতেন কিন্তু নেওয়ার কাউকে পেতেন না, তাই সেই অর্থে তাঁরা দাস মুক্ত করেছেন ও অবিবাহিতদের বিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের যুগে: উপসাগরীয় দেশগুলোতে সম্পদ এতটাই উপচে পড়ে যে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায় **জাকাতের খাত খুঁজে বের করা**; আন্তর্জাতিক দাতব্য তহবিল ঘোষণা করে যে তাদের উদ্‌বৃত্ত আছে, যা নিজ দেশে বিতরণ করা যাচ্ছে না; আর আধুনিক অর্থনীতিতে সমস্যার নাম **"অতি-উৎপাদন"** ও "অতি-ভোগ"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি "মানুষ ধনী হয়ে যাবে" নয় — তা তো সাধারণ প্রত্যাশা — বরং সম্পূর্ণ উল্টে যাওয়া এক সমীকরণ: **নেওয়া নয়, দেওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে**। এটি অবস্থার উন্নতি নয়, সমাজের গঠনেরই উল্টে যাওয়া। আর আরবি ক্রিয়াপদ **"ভাবিয়ে তোলে"** সূক্ষ্ম: অর্থ হলো তাকে উদ্বিগ্ন করে ও তার মন ব্যস্ত রাখে — অর্থাৎ সমস্যাটি মানসিক ও প্রশাসনিক, বস্তুগত নয়। আর সমকালীন জাকাত তহবিলগুলো যখন ঘোষণা করে যে উদ্‌বৃত্ত আছে অথচ খাত নেই, তখন এটিই ঠিক তার বর্ণনা। এ কথা বলা হয়েছিল এমন এক জাতিকে, যারা দিনের খাবারটুকুও পেত না।

বিজয়

92 আপনারা মিসর জয় করবেন — অধিবাসীদের প্রতি সদয় হবেন

আপনারা মিসর জয় করবেন; সেটি এমন ভূমি, যেখানে কিরাতের নাম চলে। জয় করলে এর অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচরণ করবেন, কারণ তাদের রয়েছে দায়িত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধন।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

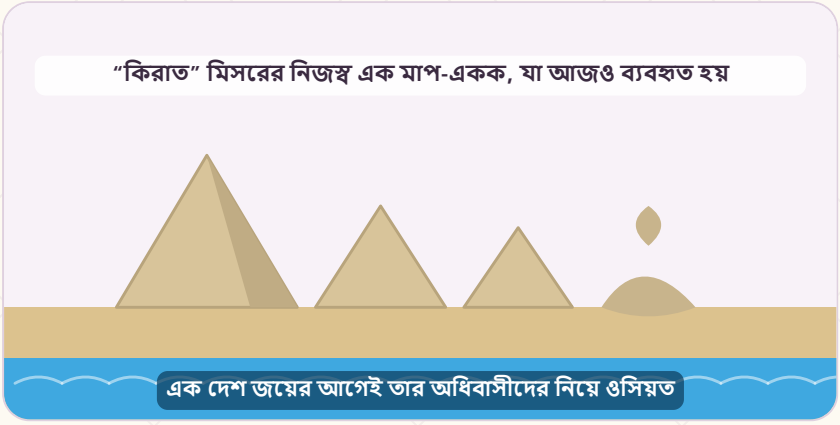

মিসর: জয়ের প্রায় দশ বছর আগেই নবী ﷺ এর অধিবাসীদের বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমরা **মিসর জয় করবে**; আর সেখানে পা রাখার আগেই তিনি এর অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। একটি চিহ্নও দিয়েছেন: এটি এমন ভূমি, যেখানে **"কিরাত"** ব্যবহৃত হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সে সময় মিসর ছিল সুরক্ষিত এক রোমান প্রদেশ, আর ইসলামি রাষ্ট্র ছিল নবীন, তখনো উপদ্বীপের বাইরে যায়নি। আরবরা মিসরকে চিনত বাণিজ্যের সূত্রে, এর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানত না। আর কোনো দেশের অধিবাসীদের বিষয়ে **তা জয়ের আগেই** ওসিয়ত করার অর্থ নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে তা জয় হবেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

20 হিজরিতে উমরের খিলাফতকালে আমর ইবনুল আসের হাতে মিসর বিজিত হয়। আর **কিরাত** হলো গ্রিক-মিসরীয় উৎসের একটি পরিমাপ-একক, যা আজও মিসরে জমি মাপতে (1 কিরাত = ফাদ্দানের 1/24 অংশ) এবং সোনার ক্ষেত্রে (21 ও 24 ক্যারেট) ব্যবহৃত হয়। এটি এমন এক একক **যা আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর ছাড়া আর কোথাও এতটা প্রচলিত নয়**। ঐতিহাসিকেরা বরাবর লিখে এসেছেন যে এই পরিভাষা মিসরবাসীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উল্লিখিত চিহ্নটিই প্রমাণ: "**এমন ভূমি, যেখানে কিরাতের নাম চলে**"। এটি এক স্থানীয় প্রচলনের মাধ্যমে পরিচয় দেওয়া, আর তা এমন এক দেশের মানুষের, যেখানে মুসলিমরা তখনো পা রাখেনি — এ ধরনের খুঁটিনাটি কেবল তিনিই বলেন যিনি জানেন। এরপর আরও বিস্ময়কর কারণটি: "কারণ তাদের রয়েছে **দায়িত্বের বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক**" — আত্মীয়তার ইঙ্গিত ইসমাইল আলাইহিস সালামের মা হাজেরার দিকে, যিনি মিসরীয়, এবং নবী ﷺ-এর পুত্র ইবরাহিমের মা মারিয়া কিবতিয়ার দিকে। অর্থাৎ ওসিয়তটি দাঁড়িয়ে আছে বাস্তব এক আত্মীয়তার উপর। একটি জাতির সঙ্গে সদাচরণের ওসিয়ত, তাদের দেশ জয়ের প্রায় দশ বছর আগে — এমন একজনের কাছ থেকে, কথাটি বলার দিনে যাঁর কোনো সেনাবাহিনীই ছিল না।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি

93 উয়াইস আল-কারানি — যাঁকে তিনি দেখেননি, তাঁর বর্ণনা

আপনাদের কাছে ইয়েমেনবাসীর সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে উয়াইস ইবনে আমির, মুরাদ গোত্রের, তারপর কারান শাখার। তার শ্বেতরোগ ছিল, তা থেকে সে সুস্থ হয়েছে — এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া। তার এক মা আছেন, যাঁর প্রতি সে অনুগত।

মুসলিম বর্ণিত — সহিহ

পাঁচ নিদর্শন, আগেই নির্ধারিত

- তাঁর নাম: উয়াইস ইবনে আমির
- তার গোত্র: মুরাদ, তারপর কারান
- শ্বেতরোগ ছিল, সেরে গেছে
- এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা বাকি
- শুধু মায়ের প্রতি অনুগত

উমর বছর কয়েক পরে এসব চিহ্নেই তাঁকে পেলেন

উমর ইবনুল খাত্তাব হজের মৌসুমে তাঁর খোঁজ করে গেছেন, যতক্ষণ না পেয়ে যান

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন একজনের বর্ণনা দিয়েছেন **যাঁকে তিনি কখনো দেখেননি, সাক্ষাৎও করেননি**: তাঁর নাম, তাঁর গোত্র, তিনি এক রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন — শুধু একটি মুদ্রার সমান ছোট দাগ ছাড়া, আর তিনি মায়ের প্রতি অনুগত। পরে উমর এই সব চিহ্নসহই তাঁকে খুঁজে পান।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উয়াইস ছিলেন ইয়েমেনের এক অখ্যাত মানুষ — মর্যাদা নেই, নামডাক নেই — আর নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি (এ কারণেই তিনি সাহাবি নন, তাবেয়ি)। ইয়েমেন আর মদিনার মধ্যে দীর্ঘ পথ, সেখানকার এক-একজন মানুষের খবর জানার কোনো উপায় ছিল না। আর বর্ণনায় রয়েছে **অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক দৈহিক চিহ্ন**, যা কেবল তিনিই জানতে পারেন যিনি তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেছেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বছরের পর বছর ইয়েমেনবাসীর সাহায্যকারী দলের মধ্যে উয়াইসের খোঁজ করেছেন, যতক্ষণ না তাঁর দেখা পান। তিনি তাঁর নাম ও গোত্র জিজ্ঞেস করেন, তারপর শ্বেতরোগের কথা জিজ্ঞেস করে দেখেন বিষয়টি ঠিক যেমন বলা হয়েছিল তেমনই; এরপর জিজ্ঞেস করেন: "আপনার কি মা আছেন?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর তাঁর কাছে নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা চাইলেন। পুরো ঘটনাটি **সহিহ মুসলিমে** রয়েছে, এ বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর একটি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একজন মানুষের মধ্যে মিলে গেছে পাঁচটি স্বতন্ত্র চিহ্ন। নাম ও বংশ হয়তো অনুমানকারীর মিলে যেতেও পারে, কিন্তু চতুর্থ চিহ্নটিই নির্ণায়ক: "**তার শ্বেতরোগ ছিল, তা থেকে সে সুস্থ হয়েছে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া**" — এটি একটি অতীত রোগের বর্ণনা, তা থেকে আরোগ্যের বর্ণনা, আর নির্দিষ্ট মাপের অবশিষ্টাংশের বর্ণনা। এক চিহ্নেই তিনটি তথ্য, আর তা অন্য দেশের এক মানুষের শরীর সম্পর্কে। বিস্ময়কর হলো, নবী ﷺ উমরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন **তাঁর কাছে দোয়া চান** — ফলে আমিরুল মুমিনিন বছরের পর বছর এক অখ্যাত রাখালকে খুঁজেছেন, নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে। একটি চিহ্নও ভুল হলে সাহাবিদের চোখের সামনেই গোটা সংবাদটি ভেঙে পড়ত।

94

নৌ-ইতিহাস

প্রথম যে বাহিনী সমুদ্রে যাবে

আমার উম্মতের যে বাহিনী প্রথম সমুদ্রপথে অভিযান করবে, তারা জান্নাত নিশ্চিত করে নিয়েছে ... তারপর তিনি বললেন: আপনি প্রথমদের একজন।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

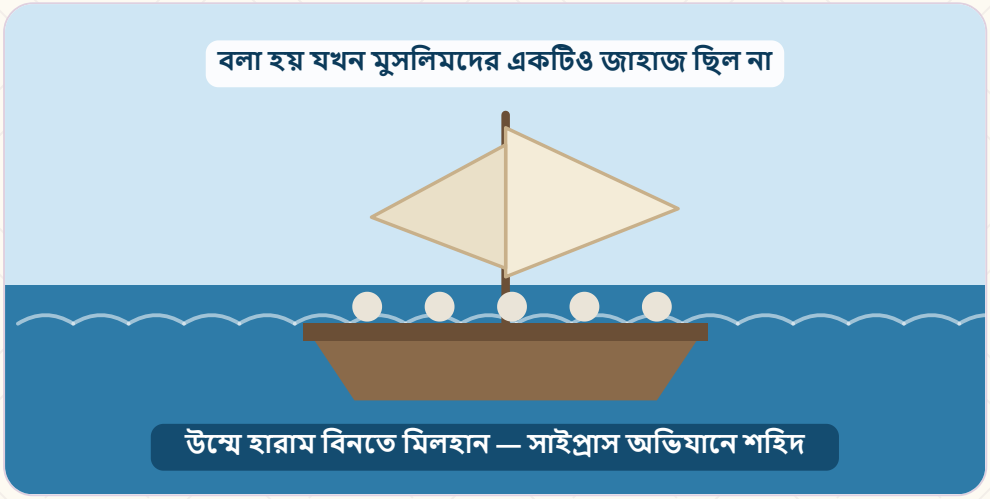

ইসলামের প্রথম নৌ-অভিযান — সাইপ্রাস, ২৪ হিজরি

সহজ কথায়

নবী ﷺ স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর উম্মতের একটি বাহিনী **সমুদ্রে যাত্রা করছে**। উম্মে হারাম দোয়া চাইলেন যেন তিনি তাদের মধ্যে থাকেন; তিনি বললেন: **"আপনি প্রথমদের একজন।"** আর তা-ই হয়েছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা ছিল স্থলের জাতি, সমুদ্রের নয়। জাহাজ ছিল না, নৌ-যুদ্ধের জ্ঞানও ছিল না; তাদের সংস্কৃতিতে সমুদ্র ছিল ভয়ের বস্তু, যা এড়িয়ে চলা হতো। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর গোটা খিলাফতকালে মানুষের নিরাপত্তার ভয়ে সমুদ্র-অভিযানের অনুমতি দেননি। তাই ইসলামি নৌবাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অত্যন্ত অসম্ভাব্য।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

২৪ হিজরিতে উসমান ইবনে আফফান মুয়াবিয়াকে সমুদ্র-অভিযানের অনুমতি দেন; প্রথম ইসলামি নৌবহর গড়ে ওঠে এবং **সাইপ্রাসে** অভিযান চালায়। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন **উম্মে হারাম বিনতে মিলহান** রাদিয়াল্লাহু আনহা; তীরে নামার পর তাঁর জন্য আনা বাহনটি তাঁকে ফেলে দিলে তিনি মারা যান এবং সেখানেই সমাহিত হন। তাঁর কবর আজও সাইপ্রাসে "হালা সুলতান তেক্কে" নামে পরিচিত, মানুষ তা জিয়ারত করে। ঘটনাটি সহিহাইনে রয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

একটি ছোট বাক্যে তিন স্তরের সংবাদ। প্রথম: এই উম্মতের আদৌ **একটি নৌবাহিনী** থাকবে — অথচ এরা মরুভূমির জাতি, জাহাজই নেই। দ্বিতীয়: একজন নির্দিষ্ট নারী **তাতে থাকবেন** — যিনি তখন মদিনায়, সমুদ্রের কথা ভাবছেনই না। তৃতীয় ও সবচেয়ে সূক্ষ্ম: তিনি থাকবেন **"প্রথমদের"** মধ্যে, পরবর্তীদের মধ্যে নয় — অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে **প্রথম অভিযানেই**, কোনো পরের যুদ্ধে নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিতীয় দলে থাকতে, কিন্তু তিনি বললেন: "আপনি প্রথমদের একজন।" নির্দিষ্টকরণটি ঠিক জায়গাতেই পড়ল। আর সংবাদের প্রায় বিশ বছর পর তিনি সেই অভিযানেই মারা যান।

ফিরকা ও ফিতনা

95

খারিজিরা — আর যার এক হাত নারীর স্তনের মতো

আপনাদের মধ্যে এমন এক দল বেরোবে, যাদের নামাজের তুলনায় আপনারা নিজেদের নামাজকে তুচ্ছ মনে করবেন ... তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি ছাড়াবে না; তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

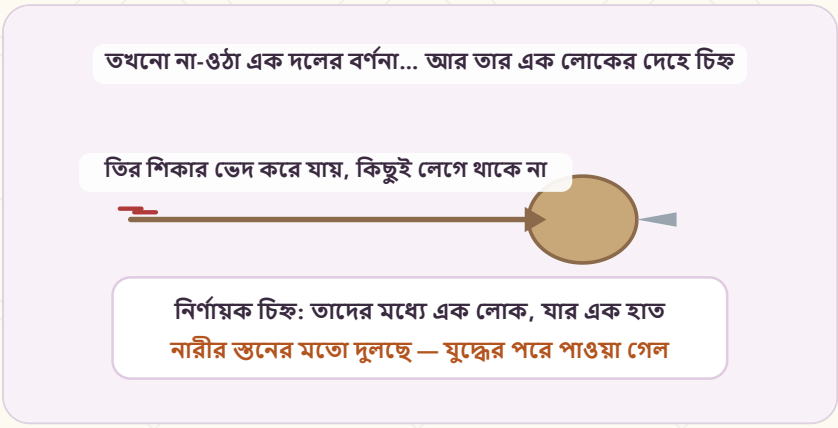

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহতদের মধ্যে তাকে খুঁজতে আদেশ দেন, যতক্ষণ না পাওয়া গেল

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন এক দলের বর্ণনা দিয়েছেন, যারা মুসলিমদের মধ্য থেকেই বেরোবে: বাইরে তাদের ইবাদত কঠোর, তারা কুরআন পড়ে, অথচ তারা **দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়**। আর তিনি একটি চিহ্ন দিলেন: তাদের মধ্যে থাকবে এমন একজন, যার হাত অসম্পূর্ণ ও অদ্ভুত আকারের।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

তখন উম্মতে কোনো ফিরকা ছিল না, বিভাজনও ছিল না। আর এমন এক দলের ধারণা, **যারা কঠোর ইবাদত ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া একসঙ্গে মেলায়** — বাইরে থেকে তা স্ববিরোধীই ঠেকত; কারণ প্রত্যাশা তো এই যে, পথভ্রষ্ট ইবাদতে শিথিল হবে, বাড়াবাড়িকারী নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খারিজিরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আত্মপ্রকাশ করে; তারা মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে, অথচ দীর্ঘ নামাজ ও বেশি তিলাওয়াতের জন্য তারা ছিল প্রসিদ্ধ। আলি ৩৪ হিজরিতে **নাহরাওয়ানে** তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের পর তিনি বর্ণিত সেই লোকটিকে খুঁজতে আদেশ দেন; নিহতদের মধ্যে খোঁজা হয়, শেষে পাওয়া যায় — এমন এক ব্যক্তি, যার এক হাত নারীর স্তনের মতো। আলি তাকবির দিয়ে বললেন: "আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসুল পৌঁছে দিয়েছেন।" ঘটনাটি সহিহ মুসলিমে রয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটিই অত্যন্ত সূক্ষ্ম: "**তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় যেভাবে তির শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়**"। তির যখন শিকারের শরীর ভেদ করে বেরোয়, তখন তা বেরোয় **পরিষ্কার, তাতে রক্ত বা মাংসের কিছুই লেগে থাকে না** — এটি তারই বর্ণনা, যে দ্বীনের ভেতর দিয়ে চলে যায় অথচ তার কিছুই সঙ্গে থাকে না, যদিও সে তাতে ছুটে চলে প্রবল বেগে। কিন্তু নির্ণায়ক হলো **দৈহিক চিহ্নটি**: এমন এক দলের নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির হাতে এক বিরল বিকৃতি — যে দল তখনো জন্মায়নি, আর এমন এক যুদ্ধে, যা তখনো ঘটেনি। আর এটি **তৎক্ষণাৎ যাচাইযোগ্য** এক চিহ্ন — এ কারণেই আলি নিজে নিহতদের মধ্যে তা খুঁজেছেন। না পাওয়া গেলে গোটা সেনাবাহিনীর সামনেই সংবাদটি ভেঙে পড়ত।

জাতি ও জনগোষ্ঠী

96 ছোট চোখ ও চওড়া মুখের এক জাতি

কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না আপনারা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়েন যাদের জুতা পশমের, আর যতক্ষণ না আপনারা তুর্কিদের সঙ্গে লড়েন — ছোট চোখ, লালচে মুখ, চ্যাপ্টা নাক, যেন তাদের মুখ স্তরে-স্তরে মোড়া ঢাল।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত — মুত্তাফাক আলাইহি

আরবরা তখন দেখেনি এমন জাতির সূক্ষ্ম নৃতাত্ত্বিক বর্ণনা

“ছোট চোখ · চওড়া মুখ · চ্যাপ্টা নাক”

মঙ্গোল আক্রমণ — সপ্তম হিজরি শতক

মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর চেহারা, আরবরা তা দেখার শত শত বছর আগেই বর্ণিত

সহজ কথায়

নবী ﷺ এমন এক জাতির বর্ণনা দিয়েছেন যাদের সঙ্গে মুসলিমরা লড়বে, আর বর্ণনা দিয়েছেন **তাদের মুখের গড়নের**: ছোট চোখ, চওড়া গোলাকার মুখ, খাটো চ্যাপ্টা নাক। এগুলোই মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠী ও মোঙ্গলদের বৈশিষ্ট্য।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

উপদ্বীপের আরবরা নিজেদের ছাড়া দেখত কেবল রোমান, পারসিক ও হাবশিদের — এদের সবার চেহারা এই বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর এশীয় তৃণভূমির জনগোষ্ঠী ছিল পারস্যের ওপারে সুদূর প্রাচ্যে, তাদের খবর উপদ্বীপে পৌঁছাত না। আরবদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না — যুদ্ধও নয়, বাণিজ্যও নয়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসে এমন তিনটি শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এসেছে, যা আজ পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত: **সরু চোখের পাতার ফাঁক ও কোণের ভাঁজ**, **উঁচু গালের হাড়সহ চওড়া চ্যাপ্টা মুখ**, আর **নিচু নাসাসেতুর খাটো নাক**। আর যুদ্ধ সত্যিই ঘটেছে: সপ্তম হিজরি শতকের মোঙ্গল আগ্রাসন, যা 656 হিজরিতে বাগদাদ ধ্বংস করে, তারপর 658 হিজরিতে **আইন জালুতে** পরাজিত হয়। এর আগে প্রথম শতক থেকেই মুসলিমরা মাওয়ারাউন্নাহরে তুর্কিদের সঙ্গে লড়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **নৃতাত্ত্বিক** বর্ণনা, রাজনৈতিক বা সামরিক নয়। আর এটি এমন একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে থেমে থাকেনি, যা দৈবক্রমে মিলে যেতে পারে; বরং একত্র করেছে **পরস্পর-সংলগ্ন চারটি বৈশিষ্ট্য**, যা একসঙ্গে এমন এক নির্দিষ্ট মুখাবয়ব গড়ে তোলে, আজকের নরগোষ্ঠীবিদ্যা যা চেনে। আর শেষ উপমাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম: “যেন তাদের মুখ **স্তরে-স্তরে মোড়া ঢাল**” — মিজান্ন মানে ঢাল, আর মুতরাকা সেই ঢাল, যাতে চামড়ার স্তর চড়ানো হয়েছে, ফলে তা হয়ে উঠেছে চওড়া, গোলাকার, অল্প উঁচু। আরব মরুভূমির একজন মানুষ চীনের ওপারে বসবাসকারী এক জাতির চেহারার বর্ণনা দেবেন, তারপর জানাবেন যে তাঁর উম্মত তাদের সঙ্গে লড়বে — এতে অনুমানের কোনো প্রবেশপথই নেই।

97

সমাজ

তারা মদ পান করবে, আর তাকে ডাকবে অন্য নামে

আমার উম্মতের কিছু লোক অবশ্যই মদ পান করবে, আর তারা তাকে তার নিজের নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকবে।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন — আলবানি সহিহ বলেছেন

নাম বদলে যায়, যাতে হারাম জিনিসটি গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা **তাকে মদ বলে ডাকবে না** — তারা তাকে অন্য নাম দেবে, যাতে তা সহজে গলা দিয়ে নামে আর তাকে জায়েজ বলে দেখানো যায়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদকে খোলাখুলি তার নিজের নামেই ডাকা হতো, আর কবিতায় তা নিয়ে গর্ব করা হতো। কেউ তাতে লজ্জা পেত না, কারও তার নাম লুকানোর প্রয়োজনও পড়ত না। তাই হাদিসটি একটি নির্দিষ্ট **মানসিক ও সামাজিক আচরণের** ভবিষ্যদ্বাণী করছে: মানুষ নিষেধাজ্ঞা স্বীকার করবে, তারপর নাম বদলে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানে এটি **"শিষ্টোক্তি"** (Euphemism) নামে পরিচিত একটি পরিঘটনা: কোনো বস্তুর নাম বদলে দেওয়া, যাতে তার ধাক্কা হালকা হয় বা তার ওপরের নিষেধাজ্ঞা এড়ানো যায়। আমাদের চারপাশ এর উদাহরণে ভরা: "স্পিরিট", "স্বাস্থ্যকর ওয়াইন", অ্যালকোহলযুক্ত "এনার্জি ড্রিংক", "গাঁজানো তেঁতুল", আর "অ্যালকোহল-মুক্ত বিয়ার" যাতে তবু কিছু পরিমাণ থেকেই যায়। একই নীতি সুদের বেলায় ("ইন্টারেস্ট", "বিনিয়োগ-মুনাফা") আর অন্যান্য হারামের বেলায়ও কাজে লাগানো হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি কোনো **কাজের** নয়, বরং **একটি ভাষাগত কৌশলের** — আর এটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও কঠিন। "কিছু লোক মদ পান করবে" বলা তো একটি প্রত্যাশিত কথা। কিন্তু **ফাঁকি দেওয়ার পদ্ধতিটি** নির্দিষ্ট করে দেওয়া — বিধান অস্বীকার নয়, বরং নাম বদলে ফেলা — এমন এক মানসিক ও সামাজিক কার্যপ্রণালীর বর্ণনা, যা সেই সমাজে চোখেই পড়ত না। আর আজ তা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের একটি পুরো অধ্যায়। এটি আরেকটি হাদিসের সঙ্গেও মিলে যায়, যাতে তাকে নিন্দা করা হয়েছে যে "নিজের দেওয়া কোনো নামে হারামকে হালাল করে নেয়" — বিধান একটিই, তার রূপ যতই হোক।

সূত্র Allan & Burridge – *Euphemism and Dysphemism*, 1991 · Euphemism

৯৪ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ ধরেই চলবে

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি ধরে চলবে, বিঘতে বিঘতে আর হাতে হাতে; এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তাদের পিছু পিছু ঢুকবে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

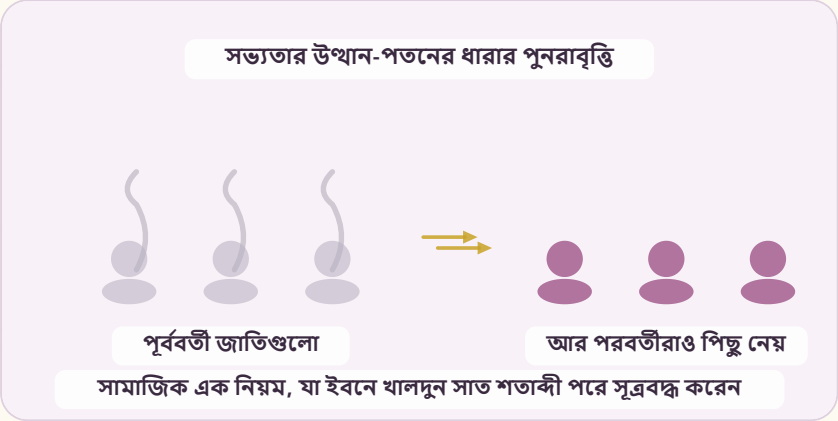

জাতিগুলো তাদের পূর্বসূরিদের ভুল এমনভাবে আবার করে যে ঐতিহাসিকেরা বিস্মিত হন

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, এই উম্মত তার পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে **পদে পদে** অনুকরণ করবে — এমনকি সেই অর্থহীন কাজগুলোতেও, যাতে কোনো উপকারই নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রচলিত ধারণা ছিল, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পথ আছে, আর মুসলিমরা তাদের দ্বীনের কারণে অন্যেরা যে গর্তে পড়েছে তাতে পড়া থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছেন। ব্যতিক্রমহীনভাবে সব জাতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো "নিয়মের" ধারণাই তখন ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান একেই বলে **সভ্যতার চক্র**। ইবনে খালদুন সাত শতাব্দী পরে তাঁর "মুকাদ্দিমা"-য় একে সূত্রবদ্ধ করেন, আর এরই ওপর অসওয়াল্ড স্পেংলার ও আর্নল্ড টয়েনবি বিশ শতকে তাঁদের তত্ত্ব দাঁড় করান: **জাতিগুলো উত্থান, বিলাসিতা ও বিলয়ের একই রকম স্তর পেরিয়ে যায়** এবং প্রায় অনিবার্যভাবে পূর্বসূরিদের ভুলগুলোই আবার করে। সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির আচরণেও এর সমান্তরাল একটি পরিঘটনা লক্ষ করেছেন, যার নাম দিয়েছেন **পালের আচরণ** (Herd Behaviour)।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সূক্ষ্মতাটি রয়েছে শেষ শর্তে: "**এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢোকে, তোমরাও তাদের পিছু পিছু ঢুকবে**"। হাদিস উপকারী জিনিসের অনুকরণের কথা বলছে না — তা তো যুক্তিসংগত ও প্রশংসনীয় — বরং **যাতে কোনো উপকার নেই, কোনো অর্থও নেই** তার অনুকরণের কথা বলছে, এমনকি যাতে স্পষ্ট ক্ষতি আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা আজ ঠিক এটিই বর্ণনা করেন আচরণের সেই হুজুগগুলো নিয়ে, যা কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর ক্রিয়াপদের জোরালো কসম-রূপটিও লক্ষ করুন: **এটি ঘটবেই বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে, কোনো সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হচ্ছে না**। আর তা ঘটেছে এমনভাবে যে কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

সূত্র Asch (1951) – the conformity experiments · Herd behaviour

শক্তির ভারসাম্য

99

জাতিগুলো একে অপরকে ডাকবে... আর স্রোতের ফেনা

অচিরেই জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমন ভোজনকারীরা তাদের খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। বলা হলো: সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব? তিনি বললেন: না, সেদিন তোমরা বরং অনেক হবে — কিন্তু তোমরা হবে স্রোতের ফেনার মতো ফেনা।

আবু দাউদ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন — আলবানি সহিহ বলেছেন

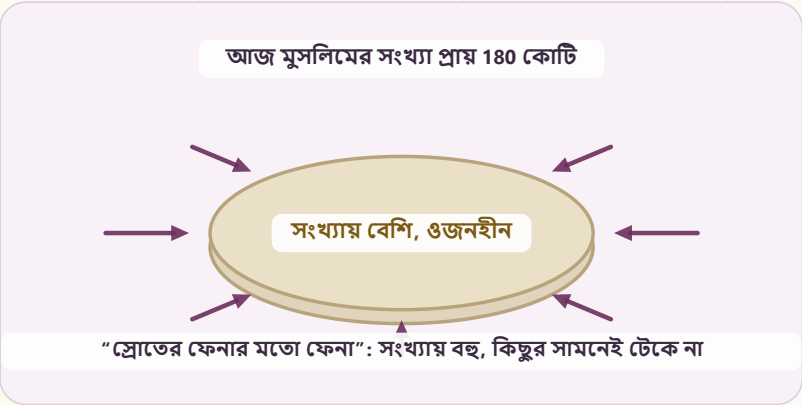

হাদিস অস্বীকার করেছে যে কারণটি সংখ্যায় কম হওয়া — আর আসল কারণটি বলে দিয়েছে

সহজ কথায়

নবী ﷺ বলেছেন, জাতিগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমন ভোজনকারীরা খাবারের পাত্রের দিকে একে অপরকে ডাকে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: সংখ্যায় কম বলে? তিনি বললেন: **না, তোমরা তো অনেকই হবে** — কিন্তু কোনো ওজন নেই, কোনো প্রভাবও নেই।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই সম্প্রদায় তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠার পথে। এক প্রজন্মের ভেতরেই তারা পারস্য, শাম, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা উন্মুক্ত করে ফেলে। তাই আসন্ন এক দুর্বলতার ভবিষ্যদ্বাণী — তাও আবার **সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে** — ঘটনার দৃশ্যমান গতির সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ মুসলিমের সংখ্যা প্রায় **দুইশ কোটি**, অর্থাৎ পিউ রিসার্চ সেন্টারের হিসাবে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় **26%**; তাদের হাতে বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি-মজুদ আর কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান। তবু বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও অর্থনৈতিক উৎপাদনে তাদের অংশ নিজেদের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য, আর তাদের ভূমিগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে সংঘাতপীড়িত ও পরনির্ভর অঞ্চলগুলোর অন্যতম। **সংখ্যা আছে, সভ্যতার ওজন নেই** — হাদিস ঠিক এই সমীকরণটিই বর্ণনা করেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই হাদিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি **ভুল ব্যাখ্যাটি আগেই ধরে ফেলে স্পষ্টভাবে তা নাকচ করেছে**। যখন জিজ্ঞাসা করা হলো "সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব?" তিনি হ্যাঁ বলেননি — বললেন "না, সেদিন তোমরা বরং অনেক হবে।" তিনি সংখ্যাকে সমীকরণ থেকে একেবারেই বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন যে **ত্রুটি গুণে, পরিমাণে নয়**। আর **"স্রোতের ফেনা"** উপমাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম: ফেনা হলো বন্যা যে ফেনা আর খড়কুটো নিজের উপরিতলে বয়ে নেয় — দেখতে প্রচুর, অথচ ওজনহীন; কোথাও থিতু হয় না, আর যেদিকে ঠেলে দেওয়া হয় সেদিকেই যায়, নিজের ইচ্ছেমতো নয়। তারপর হাদিসের বাকি অংশে তিনি কারণটিও বলে দিয়েছেন: "দুর্বলতা... দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা" — এ এক মানসিক রোগনির্ণয়, সামরিক নয়।

আগেই নাম-বলা এক প্রশ্ন

100 “তাহলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?” — জিজ্ঞাসার আগেই নাম-বলা প্রশ্ন

শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে বলে: এটি কে সৃষ্টি করেছে? ওটি কে সৃষ্টি করেছে? — এমনকি সে বলে বসে: তাহলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? কেউ সেখানে পৌঁছে গেলে সে যেন আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং থেমে যায়।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

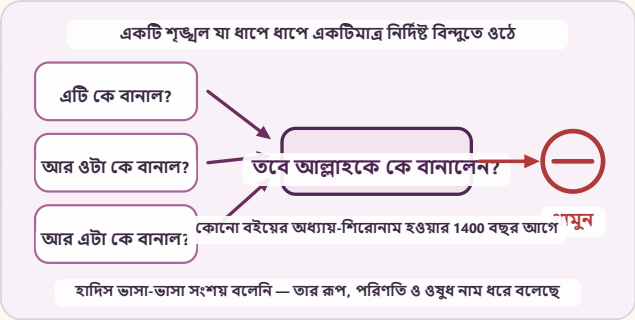

রূপ, শেষ বিন্দু আর প্রতিকার — তিনটিই একটিমাত্র বাক্যে

সহজ কথায়

হাদিসটি এক অদ্ভুত জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছে: এমন এক সংশয়, যা **একবারে আসে না, আসে শিকলের মতো** — প্রতিটি কড়া পরেরটিকে জন্ম দেয়, যতক্ষণ না তা একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নে গিয়ে থামে: **“তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?”** আর এটিই গোটা আধুনিক নাস্তিক্যবাদের সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত আপত্তি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

নবী ﷺ-এর পরিবেশে এই প্রশ্নটি চালুই ছিল না। তাঁর বিরোধীরা ছিল **মুশরিক**, নাস্তিক নয়: তারা স্রষ্টাকে স্বীকার করত আর তাঁর সঙ্গে অন্যদেরও পূজা করত — “আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ।” বিরোধটি ছিল **ইবাদত কার প্রাপ্য** তা নিয়ে, **আদৌ কোনো স্রষ্টা আছেন কি না** তা নিয়ে নয়। মক্কায় কেউ এ প্রশ্ন করেছে — এমন কোনো বর্ণনাই নেই। অর্থাৎ হাদিসটি এমন এক সংশয়ের বর্ণনা দিচ্ছে **যা তার নিজের সময়ে ছিলই না**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এই প্রশ্নটিই পরে হয়ে উঠল **আধুনিক নাস্তিক আপত্তির সবচেয়ে বড় পতাকা**। **বার্ট্রান্ড রাসেল** তাঁর 1927 সালের বক্তৃতা “কেন আমি খ্রিষ্টান নই”-এ এটি উত্থাপন করেন এবং প্রথম-কারণ যুক্তি ত্যাগ করার কারণ হিসেবে একেই দাঁড় করান। **রিচার্ড ডকিন্স** 2006 সালে *দ্য গড ডিলিউশন*-এর **চতুর্থ** অধ্যায়ের অক্ষ বানান এটিকেই — “কেন প্রায় নিশ্চিতভাবেই কোনো ঈশ্বর নেই” — তাঁর বিখ্যাত **“চূড়ান্ত বোয়িং 747”** যুক্তিতে, যেখানে তিনি বলেন, নকশাকারের অনুকল্প সঙ্গে সঙ্গেই আরও বড় একটি সমস্যা দাঁড় করিয়ে দেয়: **“নকশাকারকে নকশা করল কে?”**

আর দর্শনের উত্তরটিও ঠিক তাই, যার নির্দেশ হাদিস দিয়েছে: **থেমে যাওয়া**। কারণ প্রশ্নটি নিজের ভেতরেই একটি যৌক্তিক ত্রুটি বয়ে বেড়ায় — সে আগে ধরে নেয় যে স্রষ্টা নিজেই সৃষ্ট, তারপর তাঁর স্রষ্টার খোঁজ করে। আর যে শিকল কখনো শেষ হয় না তা কিছুই ব্যাখ্যা করে না: প্রতিটি জিনিসের যদি কারণ লাগে, তবে কোনো কিছুই কখনো অস্তিত্ব পাবে না। যুক্তিবিদেরা একে বলেন **অনবস্থা দোষ**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

হাদিসের তিনটি জিনিস অনুমানের নাগালের বাইরে:

1 — রূপ। তিনি বলেননি “মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সংশয়ে পড়বে” — এ তো এমন এক সাধারণ কথা, যা সব যুগেই খাটে। তিনি বর্ণনা করেছেন **শিকলবদ্ধ প্রশ্নের একটি গঠন**: এক প্রশ্ন টেনে আনে আরেক প্রশ্ন, সেটি টেনে আনে তৃতীয়টিকে।

2 — শেষ বিন্দু। আর শিকলটি যে শেষ স্টেশনে গিয়ে থামে, তিনি তার শব্দ ধরেই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সত্যিই সেটিই শেষ স্টেশন: এই দিকে “আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?”-এর পরে আর কোনো প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না।

3 — প্রতিকার। তিনি তর্কের নির্দেশ দেননি, দিয়েছেন শিকলটি ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ — আর এটিই সেই যৌক্তিক উত্তর, যেখানে দর্শন পৌঁছেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে: ত্রুটি প্রশ্নে, উত্তরে নয়।

আর একটি সীমা অবশ্যই বলে রাখা দরকার: এটি অন্তরের এক পরিঘটনার সংবাদ, বস্তুজগতের কোনো তথ্যের নয়; একে কোনো অণুবীক্ষণ মাপে না, কোনো দাঁড়িপাল্লাও ওজন করে না। কিন্তু এটি **পুরোপুরি খণ্ডনযোগ্য**: এই প্রশ্ন যদি এই রূপে আর বিতর্কের এই জায়গায় দেখা না দিত, তবে সংবাদটি ভেঙে পড়ত। আর তা দেখা দিয়েছে, এবং শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত নাস্তিক্যবাদী বইটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হয়ে উঠেছে। **তাহলে তাঁকে কে জানাল?**

সূত্র Bertrand Russell — *Why I Am Not a Christian*, 1927 · Richard Dawkins — *The God Delusion*, 2006 · Infinite regress — the logical fault in the question